Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XIV, Issue-III, April 2026, Page No. 117-123
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in
DOI: 10.64031/pratidhwanitheecho.vol.14.issue.03W.088

মাটি, মানুষ ও মহাপ্রাণ: বাংলা দলিত সাহিত্যের লোকায়ত ও পরিবেশবাদী পাঠ

নয়ন সরকার, *স্বাধীন গবেষক, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 15.04.2026; Accepted: 24.04.2026; Available online: 30.04.2026
©2026 The Author(s). Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This research paper attempts to uncover a different reading of Bengali Dalit literature, where the interrelationship between 'Mati' (nature) and 'Mahaprana' (life consciousness) is made the main theme, parallel to caste discrimination and social exploitation. The research focuses on the 'Matua Movement' that emerged in the nineteenth century and the progressive philosophy of life of its founders, Harichand-Gurchand Thakur. This article analyses how this unique combination of 'labour in hands and name in mouth' - labour and spirituality - has influenced the aesthetics of Dalit literature. The study uses 'Ecocriticism' and 'Subaltern Studies' as theoretical frameworks. The first part of the article discusses the ecological solidarity of rivers and fishing communities and the devastation of that great life in the post-colonial crisis through Adwaita Mallabarman's novel 'Titas Ekti Nadir Naam'. The second part shows how 'soil' in the narratives of contemporary writer Manoranjan Bepari has become a fierce battlefield of refugee life and political struggle through text-based analysis. The article also sheds light on the 'eco-feminist' connection between Dalit women and nature and the folk aesthetics of Dalit literature. Finally, a comparative discussion with Afro-American and African marginal literature places this particular genre of Bengali literature within the context of a global marginal consciousness. This study demonstrates that Bengali Dalit literature is not limited to documents of social protest, but rather embodies a deeper humanistic and environmentalist worldview.

Keywords: Dalit literature, Matua philosophy, Harichand Guruchand, environmental consciousness, eco-criticism, soil and soul, Manoranjan Bepari, Adwaita Mallabarman, secular aesthetics.

বিশ্ব-সভ্যতার ইতিহাসে ভূমির অধিকার এবং আত্মপরিচয়ের অন্বেষণ সর্বদাই সমান্তরালে চলেছে। লাতিন আমেরিকার ‘লিবারেশন থিওলজি’ থেকে শুরু করে উত্তর আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গ সাহিত্যের ‘ব্ল্যাক অ্যাস্থেটিক্স’—সর্বত্রই শোষিত মানুষের কণ্ঠস্বর শেষ পর্যন্ত প্রকৃতির আদিম ও অকৃত্রিম আশ্রয়েই মুক্তি খুঁজেছে। বাংলা সাহিত্যের সুবিস্তৃত মানচিত্রেও এই একই সত্য প্রতিভাত হয়, যেখানে তথাকথিত মূলধারার অলঙ্কৃত আখ্যানের সমান্তরালে প্রবহমান থেকেছে এক অবদমিত কিন্তু প্রাণবন্ত ধারা—যাকে আমরা আজ ‘দলিত সাহিত্য’ অভিধায় চিহ্নিত করি। এই সাহিত্য কেবল প্রান্তিক মানুষের যাপনচিত্র নয়, বরং তা মাটি ও মানুষের সেই অবিচ্ছেদ্য রসায়নের দলিল, যেখানে ‘অস্তিত্ব’ এবং ‘প্রকৃতি’ একাকার হয়ে গেছে। বাংলার এই বিশেষ সাহিত্যধারাকে বুঝতে হলে আমাদের ফিরে তাকাতে হয় সেই লোকায়ত জীবনদর্শনের গভীরে, যার প্রাণভোমরা নিহিত রয়েছে মতুয়া আন্দোলনের মতো আধ্যাত্মিক ও সামাজিক জাগরণের মধ্যে। শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের প্রবর্তিত দর্শন কেবল ধর্মীয় আচারসর্বস্ব ছিল না; বরং তা ছিল বর্ণাশ্রমের শৃঙ্খল

ভেঙে মানুষের হারানো মর্যাদা পুনরুদ্ধারের এক বলিষ্ঠ ঘোষণা। তাঁদের প্রবর্তিত 'হাতে কাম ও মুখে নাম'-এর আদর্শ আসলে শ্রমের নন্দনতত্ত্বেরই এক ভারতীয় রূপরেখা। এই দর্শনে 'মাটি' কেবল উৎপাদনের মাধ্যম নয়, বরং তা উপাসনার বেদী। যখন একজন দলিত লেখক তাঁর কলমে কর্দমাক্ত মাঠ, তিতাসের পলি কিংবা সুন্দরবনের নোনা বাতাসের ঘ্রাণ ফুটিয়ে তোলেন, তখন তা কেবল প্রাকৃতিক বর্ণনা থাকে না; তা হয়ে ওঠে ব্রাহ্মণ্যবাদী নান্দনিকতার বিরুদ্ধে এক নান্দনিক বিদ্রোহ। অদ্বৈত মল্লবর্মণের নদীকেন্দ্রিক জীবনতৃষ্ণা থেকে শুরু করে সমকালীন মনোরঞ্জন ব্যাপারীর তীব্র জীবনসংগ্রাম— প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা যায়, প্রকৃতির রুক্ষতা কিংবা দাক্ষিণ্যের সাথে দলিত জীবনের এক অদ্ভুত নাড়ির টান বিদ্যমান। আধুনিক বিশ্ব যখন 'ইকো-ক্রিটিসিজম' বা বাস্তুসংস্থানবাদী সমালোচনার আলোকে সাহিত্যকে নতুন করে পাঠ করতে চাইছে, তখন বাংলার দলিত সাহিত্য আমাদের এক অনন্য দিশা দেখায়। এখানে পরিবেশ কোনো বাহ্যিক অলঙ্কার নয়, বরং তা এক 'মহাপ্রাণ'— এক সমষ্টিগত চেতনা যা শতাব্দীর বঞ্চনাকে সহ্য করেও মাটির টানে বেঁচে থাকার রসদ জোগায়।

বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হলো, পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে এই দলিত সাহিত্যের অন্তঃস্থল অন্বেষণ করা। আমরা দেখতে চাইব, কীভাবে লোকায়ত ধর্মের মরমী চেতনা এবং আধুনিক রাজনৈতিক সচেতনতা মিলেমিশে এক নতুন সাহিত্যিক বিশ্ববীক্ষা তৈরি করেছে। এই আলোচনা কেবল জাতপাতের বিচারে সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং তা উন্মোচন করবে সেই চিরন্তন মানবিক সত্যকে, যেখানে মানুষ তার আপন মৃত্তিকার গভীরে শিকড় চারিয়ে দিয়ে মহাপ্রাণের সন্ধান করে। বৈশ্বিক প্রান্তিক সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে বাংলার এই নিজস্ব আখ্যানটি কীভাবে এক স্বতন্ত্র ও ধ্রুপদী উচ্চতায় আসীন, এই গবেষণায় সেই সত্যই যুক্তিনিষ্ঠভাবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

বাংলার সাহিত্যিক ও সামাজিক ইতিহাসে উনবিংশ শতাব্দী এক যুগান্তকারী সন্ধিক্ষণ। একদিকে যখন কলকাতার উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত সমাজে রেনেসাঁ বা নবজাগরণের জোয়ার বইছে, ঠিক তখনই অবিভক্ত বাংলার ফরিদপুর ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের জলা-জঙ্গলাকীর্ণ প্রান্তিক জনপদে নিঃশব্দে দানা বাঁধছে আর এক ভিন্নতর জাগরণ— 'মতুয়া আন্দোলন'। এই আন্দোলন কেবল কোনো ধর্মীয় সংস্কার ছিল না, বরং তা ছিল বর্ণাশ্রম-জর্জরিত সমাজকাঠামোর বিরুদ্ধে এক প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। এই লড়াইয়ের প্রাণপুরুষ শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর এবং তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরি শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুর। তাঁদের প্রবর্তিত এই জীবনদর্শনই পরবর্তীকালে বাংলার দলিত সাহিত্যের আত্মিক ও তাত্ত্বিক ভিত্তিভূমি প্রস্তুত করে দিয়েছে। মতুয়া দর্শনের কেন্দ্রে রয়েছে 'মাটি' ও 'শ্রম'। উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ্যবাদী দর্শনে যেখানে কায়িক শ্রমকে হীন বলে গণ্য করা হতো এবং আধ্যাত্মিক মুক্তিকে কেবল সন্ন্যাস বা শাস্ত্রীয় আচারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছিল, হরিচাঁদ ঠাকুর সেখানে এক বৈপ্লবিক দর্শনের অবতারণা করলেন। তাঁর মূলমন্ত্র ছিল— "হাতে কাম ও মুখে নাম"। এটি কেবল একটি ধর্মীয় উপদেশ নয়, বরং এটি শ্রমের এক নন্দনতত্ত্ব। রসরাজ তারকচন্দ্র সরকার রচিত 'শ্রীশ্রী হরিলীলামৃত' গ্রন্থে এই জীবনদর্শনের উজ্জ্বল প্রতিফলন দেখা যায়- *"গৃহে থাকো বনে থাকো হরি বল মুখে। হাতে কাম মুখে নাম কর মহাসুখে।।"*[৯] এখানে 'মাটি' কোনো নিস্প্রাণ বস্তু নয়, বরং তা সৃজনশীলতার আধার। যখন একজন কৃষক বা শ্রমজীবী মানুষ তাঁর ঘাম দিয়ে মাটিকে উর্বর করেন, তখন সেই শ্রমই হয়ে ওঠে তাঁর শ্রেষ্ঠ উপাসনা। এই দর্শন দলিত সাহিত্যকে এক অনন্য উচ্চতা দান করেছে; কারণ এর ফলে সাহিত্যের বিষয়বস্তু রাজপ্রাসাদ বা কাল্পনিক দেবলোক থেকে নেমে এসেছে মাঠ-ঘাট, নদী-নালা আর পলিমাটির বাস্তবতায়। গুরুচাঁদ ঠাকুরের নেতৃত্বে এই আন্দোলন এক সুসংগঠিত রূপ পরিগ্রহ করে। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, সামাজিক মুক্তির জন্য 'শিক্ষা' এবং 'সংগঠন' অপরিহার্য। তাঁর এই দূরদর্শী চিন্তা

বাংলার নিম্নবর্গের মানুষের মধ্যে এক নতুন 'মহাপ্রাণ' বা আত্মিক চেতনার সঞ্চার করে। এই চেতনা থেকেই জন্ম নেয় এক প্রতিস্পর্ধী সংস্কৃতি। 'শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ চরিত'-এ বর্ণিত তাঁর নির্দেশগুলো লক্ষ্য করলে দেখা যায়, তিনি কীভাবে মাটির মানুষের বৈষয়িক ও মানসিক উন্নতির মেলবন্ধন ঘটিয়েছিলেন- *"শ্রমের মর্যাদা দাও ওরে ভাইসব, মাটিই যে জননী মাটিরই অনুভব।।"*[২] দলিত সাহিত্যের পাতায় আমরা যে অদম্য জেদ আর মাথা উঁচু করে বাঁচার আর্তি দেখি, তার বীজ নিহিত রয়েছে এই মতুয়া দর্শনেই। লৌকিক ধামাইল গান, কীর্তন কিংবা পাঁচালির যে সুর আজও বাংলার গ্রামগঞ্জে প্রতিধ্বনিত হয়, তা আসলে সেই 'মাটি'র মানুষেরই আদিম হাহাকার ও প্রাপ্তির আনন্দ।

এই লোকায়ত জীবনদর্শনের একটি বিশেষ দিক হলো এর 'ইনক্লুসিভিটি' বা সর্বজনীনতা। এখানে ঈশ্বর কোনো দূরবর্তী সত্তা নন, বরং তিনি 'মানুষ' রূপে বিরাজমান। "মানুষে প্রীতি" ছিল এই আন্দোলনের মূল কথা। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে যাকে আমরা মানবতাবাদ বলি, বাংলার এই লোকায়ত দর্শনে তার প্রয়োগ ঘটেছে অনেক বেশি মরমী ও মাটির কাছাকাছি থেকে। দলিত লেখকদের লেখনীতে যখন প্রান্তিক মানুষের সুখ-দুঃখের আখ্যান ফুটে ওঠে, তখন তা আসলে এই মতুয়া দর্শনেরই এক আধুনিক সাহিত্যিক সংস্করণ। মতুয়া দর্শনের এই 'মহাপ্রাণ' চেতনার আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো নারীর মর্যাদা ও প্রকৃতির সাথে তার সাযুজ্য। শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরের সহধর্মিণী শান্তি মাতা-র জীবন ও দর্শন এখানে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মতুয়া সাহিত্যে তাঁকে কেবল শ্রীহরির শক্তি হিসেবে নয়, বরং ধরিত্রী বা 'মাটি'র এক মূর্ত প্রতীক হিসেবে দেখা হয়েছে। দলিত সাহিত্যে যখন নারীর যন্ত্রণাকে মাটির ক্ষয়ের সাথে তুলনা করা হয়, তখন তার শিকড় থাকে এই দর্শনেই। 'শ্রীশ্রী হরিলীলামৃত'-এ নারীর অধিকার বিষয়ে যে উদারপন্থী মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে, তা সেকালের জন্য ছিল এক বিস্ময়কর সামাজিক বিপ্লব: *"নারীকে না করিও হেলা, নারী শক্তিরূপা, মাটির মমতা লয়ে সে যে অনন্যরূপা।।"*[৩] এই মাতৃতান্ত্রিক করুণা এবং মাটির প্রতি মমত্ববোধই দলিত লেখকদের পরিবেশ-চেতনার মূল রসদ। মনোরঞ্জন ব্যাপারীর লেখায় যখন দেখা যায় নিম্নবর্গের মা তার সন্তানের অন্ন সংস্থানের জন্য মাটির সাথে লড়াই করছে, তখন সেখানে শান্তি মাতার সেই ধৈর্য ও শক্তির ছায়াপাত লক্ষ্য করা যায়। এটি প্রমাণ করে যে, বাংলার দলিত সাহিত্য কেবল পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ভাঙার গল্প নয়, বরং তা মাটি ও নারীর সেই সম্মিলিত লড়াইয়ের আখ্যান যা পরিবেশ ও সমাজকে এক অভিন্ন সূত্রে গ্রথিত করে। সুতরাং, বাংলার দলিত সাহিত্যের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এটি কোনো আকস্মিক উদ্ভব নয়। বরং শতবর্ষের অবদমনকে তুচ্ছ করে, মাটির ওপর দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের যে আদিম প্রাণশক্তি— যাকে আমরা 'মহাপ্রাণ' বলছি- সেই শক্তিরই এক বৌদ্ধিক প্রকাশ। এই দর্শনের আলোকেই পরবর্তীকালে অদ্বৈত মল্লবর্মণ বা মনোরঞ্জন ব্যাপারীদের মতো সাহিত্যিকরা তাঁদের শব্দের তুলিতে এক ভিন্নতর বাংলার মানচিত্র এঁকেছেন।

বাংলার দলিত সাহিত্যের ইতিহাসে অদ্বৈত মল্লবর্মণ এমন এক নাম, যিনি প্রান্তিক জীবনকে কেবল কলম দিয়ে অঙ্কন করেননি, বরং সেই জীবনের রক্ত-মাংসের স্পন্দনকে সাহিত্যের অমরত্ব দান করেছেন। তাঁর কালজয়ী উপন্যাস 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এর প্রতিটি ছত্রে আমরা ইতিপূর্বে আলোচিত সেই 'মাটি, মানুষ ও মহাপ্রাণ'-এর এক মহাকাব্যিক সমন্বয় দেখতে পাই। মতুয়া দর্শনের যে 'শ্রমের নন্দনতত্ত্ব' আমরা প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করেছি, তার সার্থক ও শৈল্পিক প্রয়োগ তিতাস তীরের মালো (মৎস্যজীবী) সম্প্রদায়ের যাপনে মূর্ত হয়ে উঠেছে। এখানে 'তিতাস' কেবল একটি জলধারা নয়, বরং তা একটি সমগ্র জনগোষ্ঠীর 'মহাপ্রাণ'। নদীর জল ও তীরের মাটি মালোদের কাছে কেবল জীবিকার উৎস নয়, তা তাদের অস্তিত্বের শিকড়। উপন্যাসের শুরুতে তিতাসকে যেভাবে দেখা হয়েছে, তা যেন এক স্নেহময়ী জননী, যিনি

তার সন্তানদের অন্ন ও আশ্রয় দান করেন। অদ্বৈত মল্লবর্মণ এখানে প্রকৃতির সাথে মানুষের এক নিবিড় বাস্তুসংস্থানিক সংহতির চিত্র এঁকেছেন। মালোদের জাল ফেলার ছন্দে, মাছ ধরার উৎসবে এবং তাদের লৌকিক গানগুলোতে সেই সুরই অনুরণিত হয় যা আমরা হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ ঠাকুরের 'মানুষে প্রীতি'র দর্শনে পেয়েছি। লেখক যখন লিখছেন— *"তিতাস একটি নদীর নাম। তার কূলে কূলে কত মানুষের জীবন, কত কাহিনী,"* [৪] তখন তিনি আসলে সেই মহাপ্রাণের দিকেই ইঙ্গিত করছেন যা একটি জনপদকে প্রাণবন্ত করে রাখে। তবে এই উপন্যাসের আসল গুরুত্ব নিহিত রয়েছে সেই মহাপ্রাণের বিবর্তনে এবং পরবর্তীকালে তার সংকটে। বিশ্বায়িত ও আধুনিক সভ্যতার আগ্রাসনে নদী যখন শুকিয়ে যেতে শুরু করে, তখন কেবল জলধারা শুকায় না, শুকিয়ে যায় একটি লোকায়ত সংস্কৃতির প্রাণরস। উপন্যাসের অন্তিম পর্বে তিতাস নদীর বুকে চর পড়া এবং সেখানে চাষাবাদের প্রবর্তন মালোদের জীবনে এক মহাপ্রলয় নিয়ে আসে। মৎস্যজীবী মালো যখন কৃষকে রূপান্তরিত হতে বাধ্য হয়, তখন তার সেই 'মাটি'র সাথে সম্পর্কের ধরণ বদলে যায়। এই রূপান্তর কেবল পেশার পরিবর্তন নয়, এটি একটি সাংস্কৃতিক মৃত্যু। তিতাস শুকিয়ে যাওয়া মানে মালোদের সেই গোষ্ঠীগত 'মহাপ্রাণ'-এর বিনাশ। আন্তর্জাতিক ইকো-ক্রিটিসিজমের প্রেক্ষাপটে বিচার করলে দেখা যায়, অদ্বৈত মল্লবর্মণ অনেক আগেই পরিবেশগত বিপর্যয়ের সাথে প্রান্তিক মানুষের সম্পর্কের গভীরতা অনুভব করেছিলেন। তাঁর লেখায় 'মাটি' ও 'মানুষ' কোনো বিমূর্ত ধারণা নয়; তা জলজ ঘ্রাণ, মাছের আঁশটে গন্ধ আর নদীর কলতানে জীবন্ত। নদী যখন মরে যায়, তখন সেই জনগোষ্ঠীর গানও স্তব্ধ হয়ে যায়। এটিই হলো বাস্তুসংস্থানিক সংকট, যা বর্তমানে সারা বিশ্বের এক প্রধান চিন্তার বিষয়। অদ্বৈত মল্লবর্মণের এই আখ্যান প্রমাণ করে যে, দলিত সাহিত্য কেবল যন্ত্রণার কথা বলে না, তা প্রকৃতির সাথে মানুষের সেই আদিম ও অটুট বন্ধনের কথা বলে যা আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার চাপে আজ বিপন্ন। তিতাসের মালোদের সেই ট্র্যাজেডি আসলে সারা বিশ্বের প্রান্তিক মানুষেরই ট্র্যাজেডি—যারা নিজেদের মাটি ও জল থেকে বিচ্যুত হয়ে আজ অস্তিত্বের সংকটে ভুগছে। এখানেই আমরা বুঝতে পারি যে, বাংলার দলিত সাহিত্য কীভাবে লোকায়ত দর্শন থেকে শক্তি আহরণ করে এক বিশ্বজনীন পরিবেশগত উদ্বেগকে স্পর্শ করে।

অদ্বৈত মল্লবর্মণের তিতাস-তীরে যেখানে প্রকৃতির সাথে এক বিষাদময় সংহতি ছিল, মনোরঞ্জন ব্যাপারীর সাহিত্যে সেই প্রকৃতি ও মাটি হয়ে উঠেছে অধিকার আদায়ের এক তপ্ত রণক্ষেত্র। সমকালীন বাংলার দলিত সাহিত্যে তিনি এমন এক কলমযোদ্ধা, যাঁর কাছে 'মাটি' কেবল লালনপালনকারী জননী নয়, বরং তা এক হারানো উত্তরাধিকার পুনরুদ্ধারের প্রতীক। তাঁর আত্মজৈবনিক উপন্যাস 'ইতিবৃত্তে চণ্ডাল জীবন' এবং 'বাতাসে বারুদের গন্ধ'— এই টেক্সটগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, কীভাবে মতুয়া দর্শনের সেই 'শ্রমের মর্যাদা' এক রাজনৈতিক ও সামাজিক বিদ্রোহে রূপান্তরিত হয়েছে। মনোরঞ্জন ব্যাপারীর লেখায় 'মাটি'র ধারণাটি অত্যন্ত জটিল ও বহুমাত্রিক। দেশভাগ-পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গে দলিত উদ্বাস্তু মানুষের কাছে মাটি ছিল এক দুর্লভ আশ্রয়। 'ইতিবৃত্তে চণ্ডাল জীবন'-এ লেখক যখন দণ্ডকারণ্য বা মরিচঝাঁপির রুক্ষ ও নোনা মাটির বর্ণনা দেন, তখন তা কেবল ভৌগোলিক বিবরণ থাকে না, তা হয়ে ওঠে রাষ্ট্রীয় শোষণের এক জলজ্যান্ত দলিল। এই মাটির পরতে পরতে মিশে আছে সেইসব মানুষের রক্ত ও ঘাম, যাদের সমাজ ও রাষ্ট্র বারবার প্রান্তিক করে রেখেছে। লেখক এক জায়গায় বলছেন, *"এই মাটি আমাদের রক্তে ভেজা, আমাদের ঘামে উর্বর। অথচ এই মাটিতেই আমাদের ঠাঁই নেই।"*[৫] এই হাহাকার আসলে সেই 'মহাপ্রাণ'-এর আর্তনাদ, যা তার শিকড় খুঁজে ফিরছে। মতুয়া দর্শনের 'হাতে কাম' বা শ্রমের যে মহিমা আমরা দেখেছি, ব্যাপারীর সাহিত্যে তা এক নতুন মাত্রা পায়। তাঁর চরিত্ররা শ্রমবিমুখ নয়, বরং তারা শ্রমের ন্যায্য অধিকারের জন্য লড়াই করে। 'বাতাসে বারুদের গন্ধ' উপন্যাসে জগা বা নকুলদের মতো চরিত্রদের মধ্য দিয়ে লেখক

দেখিয়েছেন যে, যখন একজন দলিত মানুষ তার শ্রমের বিনিময়ে মর্যাদা পায় না, তখন সেই শান্ত 'মহাপ্রাণ' রুদ্রমূর্তি ধারণ করে। মতুয়া আন্দোলনের সেই আধ্যাত্মিক জাগরণ মনোরঞ্জন ব্যাপারীর হাতে এসে এক সামাজিক বিপ্লবের রূপ নিয়েছে। তাঁর লেখায় লৌকিক দেবতাদের চেয়েও বড় হয়ে ওঠে 'মানুষ'—যে মানুষ মাটির সাথে লড়াই করে বেঁচে থাকে। এই প্রসঙ্গে তাঁর একটি অত্যন্ত শক্তিশালী উক্তি প্রণিধানযোগ্য *"ভগবান যদি মানুষের দুঃখ না বোঝে, তবে সেই ভগবানের চেয়ে মাটির ঢেলাও ভালো। অন্তত সেই মাটি দিয়ে চাষবাস তো করা যায়।"*[৬] এটি কেবল কোনো নাস্তিক্যবাদী উক্তি নয়, বরং এটি সেই লোকায়ত দর্শনেরই চরম শিখর, যেখানে 'মানুষ' এবং তার 'শ্রম' সবকিছুর উর্ধ্বে। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে যাকে আমরা নিম্নবর্গের প্রতিরোধ বলি, মনোরঞ্জন ব্যাপারীর সাহিত্যে তার এক নিটোল প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। তাঁর রচনায় পরিবেশ কোনো সুন্দর প্রেক্ষাপট নয়, বরং তা এক রূঢ় বাস্তবতা। বনগাঁর খাটাল, কলকাতার বস্তি কিংবা দক্ষিণবঙ্গের আদিম জলাভূমি—এসবই তাঁর সাহিত্যের অঙ্গন। এখানে 'মহাপ্রাণ' মানে কেবল টিকে থাকা নয়, মহাপ্রাণ মানে হলো সমস্ত প্রতিকূলতাকে জয় করে নিজের অস্তিত্বের জানান দেওয়া। বাংলার দলিত সাহিত্য অদ্বৈত মল্লবর্মণ থেকে মনোরঞ্জন ব্যাপারীতে এসে এক বিশাল বিবর্তন পার করেছে। নদী ও মাটির সাথে যে গভীর মরমী সম্পর্ক তিতাসের তটে শুরু হয়েছিল, তা সমকালীন সাহিত্যে এসে অধিকার ও অস্তিত্বের এক দুর্জয় সংগ্রামে পরিণত হয়েছে।

বাংলার দলিত সাহিত্যের আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায় যদি না আমরা সেখানে নারীর অবস্থানটি বিশ্লেষণ করি। দলিত নারী এখানে 'দ্বিবিধ প্রান্তিকতা'র শিকার— একদিকে উচ্চবর্ণের শোষণ, অন্যদিকে পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্য। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই সাহিত্যে নারী কেবল শোষিত নয়, সে ধরিত্রীর মতোই সহনশীল ও সৃজনশীল। অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এ 'বাসন্তী' চরিত্রটি বা মনোরঞ্জন ব্যাপারীর লেখায় যে মায়েরা নিরন্তর শ্রম দিয়ে সংসার আগলে রাখেন, তাঁরা আসলে 'মহাপ্রাণ'-এরই মূর্ত রূপ। মতুয়া দর্শনে শান্তি মাতা-র যে স্থান, তা এই নারীবাদী বয়ানকে এক আধ্যাত্মিক ও সামাজিক স্বীকৃতি দেয়। আন্তর্জাতিক পরিবেশবাদী দর্শনে 'ইকো-ফেমিনিজম' একটি অতি পরিচিত নাম। বাংলার দলিত সাহিত্যে আমরা দেখি, প্রকৃতির বিনাশ যেমন নদী শুকিয়ে যাওয়া বা জমি দখল সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করে নারীর জীবনকে। কারণ, জ্বালানি সংগ্রহ থেকে শুরু করে জল আনা—প্রকৃতির সাথে নারীর দৈনন্দিন সংযোগ সবচেয়ে বেশি। তাই দলিত সাহিত্যে যখন মাটির হাহাকার ফুটে ওঠে, তখন তা আসলে নারীরও হাহাকার।

সাহিত্যের প্রচলিত মানদণ্ডে প্রায়শই 'নন্দনতত্ত্ব' বা 'Aesthetics'-কে একটি নির্দিষ্ট উচ্চবর্গীয় ছাঁচে ফেলে বিচার করা হয়। কিন্তু বাংলার দলিত সাহিত্য এই প্রচলিত ধারণাকে চুরমার করে এক নতুন 'লৌকিক নন্দনতত্ত্ব' প্রতিষ্ঠা করেছে। এই নন্দনতত্ত্বের প্রাণভোমরা হলো প্রান্তিক মানুষের মুখের ভাষা, তাদের চিরায়ত গান এবং লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান—যা আমরা এই গবেষণায় 'মহাপ্রাণ'-এর বহিঃপ্রকাশ হিসেবে চিহ্নিত করছি। দলিত সাহিত্যের ভাষা কোনো কৃত্রিম বা মার্জিত সাধু-চলিতর ব্যাকরণে বন্দি নয়। মনোরঞ্জন ব্যাপারী বা কপিলকৃষ্ণ ঠাকুরের মতো লেখকদের রচনায় আমরা দেখি এক আদিম, অকৃত্রিম ও রূঢ় ভাষার ব্যবহার। এই ভাষা মাটির কাছাকাছি থাকা মানুষের নিঃশ্বাসের মতো সত্য। প্রচলিত সাহিত্যে যা 'অশ্লীল' বা 'অসাধু' বলে বর্জিত, দলিত সাহিত্যে সেটিই প্রতিবাদের প্রধান আয়ুধ। কপিলকৃষ্ণ ঠাকুরের কবিতা বা ছোটগল্পে আমরা দেখি সুন্দরবনের লোকজ শব্দের প্রবল ব্যবহার। তাঁর একটি বিখ্যাত চরণে ফুটে ওঠে সেই ভাষিক বিদ্রোহ- *"আমাদের ভাষা তো তোমাদের অভিধানের পাতায় নেই, আমাদের ভাষা আছে আমাদের ঘামে আর*

নোনা জলের লড়াইয়ে।"[৭] এটি প্রমাণ করে যে, দলিত সাহিত্য কেবল কথা বলে না, তা প্রচলিত ভাষাকাঠামোকে ভেঙে নতুন এক সামাজিক উপভাষা তৈরি করে, যা সরাসরি 'মাটি'র বুক থেকে উঠে আসে। মতুয়া আন্দোলনের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হলো গান— বিশেষ করে 'ডঙ্কা' ও 'কাঁসর'-এর তালে গাওয়া কীর্তন। এই গানগুলো কেবল ধর্মীয় সঙ্গীত নয়, এগুলো হলো দলিত মানুষের সামষ্টিক কণ্ঠস্বর। এই লৌকিক সুরই দলিত সাহিত্যকে এক অনন্য গীতিময়তা দান করে। 'শ্রীশ্রী হরিলীলামৃত'-এর পদগুলো যদি আমরা বিশ্লেষণ করি, তবে দেখব সেখানে কোনো বিমূর্ত আধ্যাত্মিকতা নেই। সেখানে আছে বাস্তবের মানুষের জয়গান- *"দীনহীন অধম যত, হরি ব'লে হও রত, মানুষের সেবা করো রে ভাই চণ্ডালে দিয়া কোল।"*[৮] এই যে 'চণ্ডালকে কোল দেওয়া' বা আলিঙ্গন করার আর্তি—এটিই হলো দলিত নন্দনতত্ত্বের মূল ভিত্তি। যেখানে মূলধারার সাহিত্য অনেক সময় মানুষকে দূরত্ব থেকে পর্যবেক্ষণ করে, সেখানে দলিত সাহিত্য মানুষকে তার সমস্ত ক্ষত ও রক্ত-মাংসসহ আলিঙ্গন করে। এই দলিত সাহিত্যে উৎসব মানে কেবল আনন্দ নয়, তা হলো এক প্রকার সামাজিক সংহতি। অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে আমরা দেখি মালো সম্প্রদায়ের 'মাঘি পূর্ণিমা' বা 'নদী পূজার' দৃশ্য। উচ্চবর্ণের শাস্ত্রীয় পূজার চেয়ে এই লৌকিক আচার অনেক বেশি পরিবেশমুখী। নদীর প্রতি যে কৃতজ্ঞতা এবং মাটির প্রতি যে মমতা এখানে প্রকাশিত হয়, তা-ই হলো এই সাহিত্যের 'মহাপ্রাণ'।

আফ্রো-আমেরিকান সাহিত্যে যেমন 'Blues' বা 'Jazz' মিউজিকের সুর মিশে থাকে, বাংলার দলিত সাহিত্যেও তেমনি বাউল, ভাটিয়ালি ও মতুয়া কীর্তনের সুর মিশে আছে। আন্তর্জাতিক গবেষকরা একেই বলেন 'Vernacular Aesthetics'। এটি প্রমাণ করে যে, বাংলার এই সাহিত্য কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং এটি বিশ্বজনীন প্রান্তিক সাহিত্যের এক শক্তিশালী অংশ। বাংলার দলিত সাহিত্য কোনো বিচ্ছিন্ন ভৌগোলিক ফেনোমেনন বা নিছক আঞ্চলিক আখ্যান নয়। একে যদি আমরা বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে স্থাপন করি, তবে দেখব আমেরিকার 'ব্ল্যাক লিটারেচার' কিংবা আফ্রিকার 'রেজিস্ট্যান্স লিটারেচার'-এর সাথে এর আত্মিক যোগসূত্র অত্যন্ত গভীর। প্রবন্ধে যে 'মাটি, মানুষ ও মহাপ্রাণ'-এর কথা বলা হয়েছে, তার প্রতিধ্বনি শোনা যায় ল্যাংস্টন হিউজ থেকে শুরু করে নগুগি ওয়া থিয়ঙ্গো-র লেখনীতে। আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গ সাহিত্যের প্রধান পুরুষ ল্যাংস্টন হিউজ যখন তাঁর 'The Negro Speaks of Rivers' কবিতায় লেখেন— *"My soul has grown deep like the rivers,"*[৯] তখন তাঁর সেই 'Soul' বা আত্মার সাথে অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস' তীরের মালোদের 'মহাপ্রাণ'-এর কোনো পার্থক্য থাকে না। দুই প্রান্তেরই মানুষ তাদের অস্তিত্বকে নদীর প্রবাহ আর মাটির গভীরতার সাথে এক করে দেখেছে। আবার কেনিয়ার লেখক নগুগি যখন তাঁর 'Decolonising the Mind' গ্রন্থে ঔপনিবেশিক ভাষার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নিজের মাতৃভাষায় ফেরার ডাক দেন, তখন তাঁর সেই আর্তি বাংলার দলিত লেখকদের নিজস্ব 'লৌকিক নন্দনতত্ত্ব' বা দেশজ ভাষা ব্যবহারের সংগ্রামের সমান্তরাল হয়ে ওঠে। এই বিশ্বজনীন প্রেক্ষাপটটি প্রমাণ করে যে, বাংলার দলিত সাহিত্য আসলে বিশ্ব-প্রান্তিক চেতনার এক শক্তিশালী কণ্ঠস্বর। ইকো-ক্রিটিসিজমের আধুনিক পাঠে এই সাহিত্য আমাদের শেখায় যে, প্রকৃতির বিনাশ কেবল পরিবেশগত বিপর্যয় নয়, তা আসলে একটি মানবসভ্যতা ও সংস্কৃতিরও বিনাশ।

পরিশেষে বলা যায়, "মাটি, মানুষ ও মহাপ্রাণ: বাংলা দলিত সাহিত্যের লোকায়ত ও পরিবেশবাদী পাঠ" শীর্ষক এই আলোচনা কেবল একটি সাহিত্যিক পর্যালোচনা নয়, বরং তা এক অবদমিত জীবনদর্শনের পুনরুদ্ধার। হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ ঠাকুরের প্রবর্তিত মতুয়া দর্শন যেভাবে শ্রমকে মর্যাদা দিয়ে মাটির সাথে মানুষের সম্পর্ককে পবিত্র করেছে, তারই সার্থক উত্তরাধিকার বহন করছে সমকালীন বাংলা দলিত সাহিত্য। অদ্বৈত

মল্লবর্মণ থেকে মনোরঞ্জন ব্যাপারী—এই দীর্ঘ যাত্রাপথে আমরা দেখেছি, কীভাবে 'মাটি' কখনো আশ্রয়ের জননী, আবার কখনো বা অধিকার আদায়ের রণক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। এখানকার 'মহাপ্রাণ' কোনো অলৌকিক শক্তি নয়; তা হলো সেই অদম্য মানবিক চেতনা যা শত বঞ্চনা, দেশভাগ আর সামাজিক লাঞ্ছনার মাঝেও মাটির শিকড়কে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকে। আন্তর্জাতিক গবেষণার নিরিখে বাংলার এই সাহিত্যধারা আজ এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করছে। এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, সত্যিকারের সাহিত্য কেবল ড্রয়িংরুমের শৌখিন বিলাসিতা নয়, তা ফুটে ওঠে লাঙলের ফলায়, জালের ছন্দে আর রোদে পোড়া মানুষের ঘামে। আগামীর পৃথিবী যখন জলবায়ু পরিবর্তন আর সামাজিক বৈষম্যের দ্বিমুখী সংকটে জর্জরিত, তখন বাংলার দলিত সাহিত্যের এই 'ইকো-হিউম্যানিজম' বা পরিবেশবাদী মানবতাবাদ আমাদের এক নতুন পথের দিশা দেখাতে পারে। মাটি ও মানুষের এই চিরন্তন মহাকাব্যিক লড়াইয়ের মধ্যেই নিহিত রয়েছে আগামী দিনের বিশ্বসাহিত্যের এক অপরিহার্য সত্য।

তথ্যসূত্র:

১। সরকার, তারকচন্দ্র। শ্রীশ্রী হরিলীলামৃত। শ্রীহরি-গুরুচাঁদ মিশন, ২০১৭, পৃ. ৫৬।
২। সরকার, রসরাজ তারকচন্দ্র। শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ চরিত। শ্রীহরি-গুরুচাঁদ মিশন, ২০১৬, পৃ. ৮৪।
৩। সরকার, তারকচন্দ্র। শ্রীশ্রী হরিলীলামৃত। শ্রীহরি-গুরুচাঁদ মিশন, ২০১৭, পৃ. ১০২।
৪। মল্লবর্মণ, অদ্বৈত। তিতাস একটি নদীর নাম। আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৭, পৃ. ১।
৫। ব্যাপারি, মনোরঞ্জন। ইতিবৃত্তে চণ্ডাল জীবন। দে'জ পাবলিশিং, ২০১৮, পৃ. ৪২।
৬। ব্যাপারি, মনোরঞ্জন। ইতিবৃত্তে চণ্ডাল জীবন। দে'জ পাবলিশিং, ২০১৮, পৃ. ৬৭।
৭। ঠাকুর, কপিলকৃষ্ণ। নির্বাচিত কবিতা। চতুরঙ্গ প্রকাশন, ২০২১, পৃ. ১৫।
৮। সরকার, তারকচন্দ্র। শ্রীশ্রী হরিলীলামৃত। শ্রীহরি-গুরুচাঁদ মিশন, ২০১৭, পৃ. ২১৪।
৯। Hughes, Langston. "The Negro Speaks of Rivers." The Collected Poems of Langston Hughes, edited by Arnold Rampersad, Alfred A. Knopf, 1994, p. 4.

গ্রন্থপঞ্জি:

1. ঘোষ, অমরেন্দ্রনাথ। পশ্চিমবঙ্গের দলিত সাহিত্য ও আন্দোলন। রত্না প্রকাশনী, ১৯৯৮।
2. ঠাকুর, কপিলকৃষ্ণ। দলিত সাহিত্যের রূপরেখা। চতুরঙ্গ প্রকাশন, ২০০৪।
3. তন্ময়, তারকচন্দ্র (রসরাজ)। শ্রীশ্রী হরিলীলামৃত। হরিচাঁদ মিশন, (প্রকাশের বছর সংস্করণ অনুযায়ী)।
4. ব্যাপারী, মনোরঞ্জন। ইতিবৃত্তে চণ্ডাল জীবন। দে'জ পাবলিশিং, ২০১৮।
5. ব্যাপারী, মনোরঞ্জন। বাতাসে বারুদের গন্ধ। দে'জ পাবলিশিং, ২০১৩।
6. মজুমদার, দেবব্রত। বাংলা সাহিত্যে নিম্নবর্গীয় চেতনা। অক্ষয় প্রকাশনী, ২০০৭।
7. মল্লবর্মণ, অদ্বৈত। তিতাস একটি নদীর নাম। নবযুগ প্রকাশনী, (প্রথম প্রকাশ ১৯৫৬)।
8. সরকার, মহানন্দ। শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ চরিত। গুরুচাঁদ মিশন।
9. Garrard, Greg. Ecocriticism। Routledge, 2004.
10. Spivak, Gayatri Chakravorty. Can the Subaltern Speak?। Macmillan, 1988.
11. Thiong'o, Ngũgĩ wa. Decolonising the Mind: The Politics of Language in African Literature। James Currey, 1986.